অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

ইহলোক

সম্প্রতি মা’র কিছু চিঠি আমাকে ভারি অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছে। চিঠিতে আর আগের মতো অনিয়মিত টাকা পাঠানোর অভিযোগ থাকে না। মাসের এক দু তারিখে ডাকযোগে টাকা না পাঠালে ক্ষোভে দুঃখে চিঠি—আমি মরি না কেন, মরলে তোমরা বেঁচে যাও, মা’র এমনতর আক্ষেপ থাকে চিঠিতো কিন্তু সম্প্রতি সব চিঠিতে কেবল বাবার নামে অভিযোগ তোমার বাবা রোজ শিয়রে এসে বসে থাকেন। আমাকে সঙ্গে যেতে বলেন। যাই কি করে! ঝুমির বিয়ে না দিয়ে কোথাও আমি নড়ছি না। বলে দিয়েছি, সেখানে সে যত স্বর্গসুখই থাকুক। পরের চিঠিতে আবার লিখেছে, বেহায়ার মতো বসে থাকে—কি যে করি! তারপরের চিঠিতে লিখেছে—তোমরা তো। জান, তোমাদের বাবা এ-রকমেরই। একবার গোঁ ধরলেই হল। কার নিস্তার আছে তাঁর হাত থেকে রক্ষা পায়! শেষে লিখছে, এবারে বাৎসরিকে ভেবেছি দ্বাদশব্রাহ্মণ ভোজন করাবা তোমার পঞ্চতীর্থ কাকার বিধান। তুমি আসবে।

আমি না গেলেও বাৎসরিক আটকাবে না। যা করার পিলুই করে। খরচের বহরটা শুধু বহন করা আমার দায়। শেষ চিঠিটা আজই অফিস থেকে ফিরে এসে পেয়েছি। আর্থিক

সচ্ছলতা যতই থাক, অকারণে আবার এতটা খরচ—ভাবতে গিয়ে বসে পড়লাম। নন্দিনী চিঠিটা এগিয়ে দিয়ে বলেছিল, নাও সামলাও।

সামলানোটা যে কি একমাত্র আমি বুঝি কারণ যে যার সংসার টানে সেই জানে কত দায় মানুষের। আর যে বোঝা বয়, সে বোধ হয় বোঝা বইতেই ভালবাসে। কাঁধ শক্ত হয়ে গেছে, ঘাড়ে ঘা হয়ে গেছে, মাছি ভনভন করে উড়ছে—সে সেটাও টের পায় না।

আর আজীবন যদি মানুষটা এভাবে বোঝা বইতে বইতে মুখ থুবড়ে পড়ে যায়—তবে কে। সামলাবে সব! কাজেই আমি যতটা না তিক্ত, নন্দিনী তার চেয়ে বেশি দু'জনেরই চিঠি পেয়ে মুখ গোমড়া। নন্দিনী বেশী কথা বলে না একটা দুটো কথা। ঐ দুই একটাই এমন খোঁচা যা আরও বেশি রক্তপাত ঘটায়সারাজীবন শুধু করেই গেলে, তোমার যদি কিছু হয়, কেউ আমার পাশে এসে দাঁড়াবে! ছেলেপুলে নিয়ে শেষে আমি দাঁড়াব কোথায়! এত যে কর, কই আমার বিপদে আপদে কেউ তো আসে না! তুমি কেমন আছ জানতে চায় না!

চিঠি পেয়ে আমি এমনিতেই বিরক্ত, তার উপর নন্দিনীর তিক্ত কথাবার্তা মেজাজটাকে সহসা ভারি রুক্ষ করে তুলল। আমার মা ভাই বোন সম্পর্কে নিন্দা করলে এটা আমার হয়। আর নন্দিনীও মিছে কথা বলেনি। বিশেষ কোনো সঞ্চয় নেই, ছেলেপুলে সব মানুষ হতে বাকি, এদিকে ঠিক বাবার সংসারে টাকা যুগিয়ে যাওয়া—মাসে মাসে কামাই নেই। দু বোনের বিয়ে বাবার কাজ সবই করে যাচ্ছি। উটকো দায় বাবা আরও রেখে গেছেন, সে বুঝি যতই নন্দিনীকে বুঝিয়েছি—আর মাথা পাতছি না, তত নন্দিনীর এক কথা, যা একখানা মানুষ, তুমি আবার মাথা পাতবে না। নন্দিনী বোঝে, জানে, আমি গোপনেও

টাকা পয়সা দিয়ে থাকি। ভাইঝির বিয়ে আমার টাকা ছাড়া হবে সে বিশ্বাসই করতে পারে না। ফলে যা হয় এক কথা দু কথা, নন্দিনীর অভিযোগ, তোমার অন্য ভাইরা তো বেশ বিয়েথা করে আলাদা হয়ে গেল, বাড়িতে মেজজনের এত দুধ হয়, এক ফোঁটা দুধ পর্যন্ত দেয় না। তুমি আবার আলাদা মা'র জন্যে দুধের টাকা পাঠাচ্ছ। ওরা মা'র ছেলে নয়!

অকাট্য যুক্তি জবাব দিতে পারি না। তবু কেন যে নন্দিনীর উপর আমার রাগ হয়। রাগ বাড়ে। শত হলেও তারা ছোট ভাই, পারে না। স্ত্রী অশান্তি করে দুধ দিলে। সংসারে স্ত্রী যদি স্বামীর সঙ্গে অশান্তি করে, তবে সে কত অসহায়, নিজের জীবন দিয়েও সেটা বুঝেছি। কাজেই নন্দিনীকে না বলে পারিনি, বাদ দাও। ও-সব ভেবে লাভ নেই। পারলে দেব, না পারলে দেব না। দ্বাদশব্রাহ্মণ ভোজনে আমার কাজ নেই।

নন্দিনী রান্নাঘর থেকে বলল, তুমি না দিয়ে থাকার লোক! তোমাকে আমি চিনি না! এবং ক্ষোভে দুঃখে মনে হল নন্দিনী খুবই ক্ষেপে গেছে। কাঁচের প্লেট ভেঙে খানখান হল। একটা তীক্ষ্ণ আওয়াজ এবং আমার ভেতরে কেমন এক অসহায় করুণ ছবি—যেন সব দুলে উঠছে। ছোট ছেলে দৌড়ে আসছে দেখলাম, স্ত্রী রান্নাঘর থেকে উঠে আসছে—তারপর আর কী হয়েছে আমার জানা নেই।

গভীর রাতে দেখলাম, নন্দিনী আমার শিয়রে বসে রাত জাগছে। ঘরে জিরো পাওয়ারের আলো জ্বালা নন্দিনীর চোখে জলের দাগ—এখনও ভাল করে শুকায়নি।

চারপাশ কেমন নিস্তব্ধ। নিঝুমা আমার কি হয়েছিল মনে করতে পারছি না। তবু কেন যে কানে বাজছে, তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই। সেই গভীর অতলে ডুবে যেতে যেতে শুনেছিলাম, নন্দিনীর বালিকার মতো হাউহাউ কান্না। বললাম, ভাল আছি। শুয়ে পড়।

নন্দিনী শুধু বলল, তুমি ঘুমোও। কথা বোলো না।

সকালে কোনো ক্লান্তি বোধ করলাম না। আর দশটা দিনের মতোই সব কিছু স্বাভাবিক লাগছে। ডাক্তার এলেন বললেন, খুব যে লো ব্লাড প্রেসার বাধিয়ে বসে আছেন ভাল খাওয়া দাওয়া করুন। ই সি জি-টা করা দরকার। এরপর যা হবার হয়ে যাবে। শরীরের যাবতীয় পরীক্ষা—লো ব্লাড প্রেসার ছাড়া সব কিছুই স্বাভাবিক। কেন যে এমন হল ভাবতে বিস্ময় লাগছে। আরো বিস্ময়, তিন চারদিন যেতে না যেতে দেশ থেকে দেখি ভাই-বোনেরা এবং মা সবাই হাজির। নন্দিনীর কাজা নন্দিনী একা ভরসা পাচ্ছে না বুঝতে পারলাম সে খুবই ঘাবড়ে গেছে। সে তার বাপের বাড়ির আত্মীয়-স্বজনদেরও হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে গেছি খবরটা ঠিক পৌঁছে দিয়েছে।

ফলে বাড়িতে লোকসমাগম একটু বেশি মা এসেই আমার হাত দুটো ধরে বলল, বাবা, তুই আমার আগে চলে যাস না কথা দে।

হেসে বললাম, তোমরা এত ঘাবড়ে গেলে কেন বুঝি না।

মা’র আবার অনুরোধ, মাথার কাজটাজ আর তোর বেশি করতে হবে না। সংসার যেভাবে চলছে চলবে।

একতলা দোতলা মিলে বাড়িতে অনেকগুলি ঘর। আমরা বাড়িতে চারটি প্রাণী—আমি নন্দিনী, ছবি, বকুল আর কাজের লোক মহানন্দা ঘরগুলো ফাঁকাই পড়ে থাকে। সবাই আসায় সহসা বাড়িটা যেন আবার জেগে উঠেছে, ভাল বাজার, রকমারি রান্না এবং সবাই একসঙ্গে মেঝেতে খেতে বসা। কত রকমের কথা তখন ভাইবোনদের। কতদিন পর আমরা আবার এক-বাড়িতে একসঙ্গে। কতদিন পর আসন পেতে বসা, খাওয়া—গল্প জীবনটা তো এভাবেই আমাদের আরম্ভ হয়েছিল। সবাই আমরা আছি—কেবল বাবা নেই।

সবাই আমরা ছড়িয়ে পড়েছি।–কেবল বাবা নেই।

মহানন্দ আমাদের পরিবেশন করছে। আমরা ভাইরা একপাশে-ওপাশেদু বোনা আমার দুই ছেলে কাকাদের সঙ্গে খেতে বসেছে। মা একটু আলগা হয়ে আছে। সাদা পাথরের থালায় তাঁর ভাতা নিরামিষ রান্না নিজে করেছে। স্বপাকে ছাড়া খায় না। বয়স তাঁকে কাবু করতে পারেনি। সাদা কদমছাঁট চুল। সাদা থানা সত্তর বছরটা তাঁর কাছে কোন বয়স নয়—মা'র কথাবার্তা শুনলে এমনই মনে হয়।

আমি কথাটা তুললাম। বললাম, বাবা কি তোমার শিয়রে রোজই এসে বসে থাকে!

মা ঢকঢক করে ঘটিতে আলগা করে জল খাচ্ছিলা বলল, রোজ না। মাঝে মাঝে আসে।

তুমি বাবাকে ভয় পাও দেখছি। আগে তো পেতে না। বাবা তো সব কথায় বলত, তোর মা কি বলে দ্যাখা তুমি বললেই আমাদের সব হয়ে যেত।

মা কেমন বিশ্বাসের গলায় বলল ভয় এখনও পায়। তোমাদের বাবা যা একখানা মানুষ ছিল। দেশ থেকে এসে তো তৃণটুকু নেড়ে দেখল না। আমার জন্য কিছু রেখে গেলে বৌদের এত মুখনাড়া খাই!

নন্দিনীর মুখটা কেমন গম্ভীর হয়ে গেল। নন্দিনী বলল, মা, আমরা তো সাধ্যমতো করি।

মা বলল, তোমাকে বলিনি বৌমা তোমরা করছ বলেই তো বেঁচে-বর্তে আছি।

মা'র এ-সব কথা আমার ভাল লাগছিল না। কারণ মাকে আমি জানি। বড় জেদি আমার মা এবং সরল। ছোট ভাইরা পাশে বসে খাচ্ছে—মা'র অভিযোগে ওরা রুষ্ট হতে পারে এমন সুন্দর জীবন তো মানুষের বড় একটা আসে না। কথা ফেরাবার জন্য বললাম, ভয় পায় বলেই বোধ হয় রোজ আর আসতে সাহস পায় না।

পিলু বলল, জানিস দাদা, বাবাকে আমিও মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখি। কেবল বলে, এই পিলু, দরজা খোলা আমি তোর বাবা। দরজা খুললে দেখি বাবার মাথায় একটা বড় বোঁচকা। ওটা কেবল তাঁর মাথা থেকে নামাতে বলেন।

তা বাবা বোঁচকাটা নামাতে বলতেই পারেনা দেশ ছেড়ে আসার পর আমাদের ঘরবাড়ি ছিল না। এখানে সেখানে যাযাবরের মতো দিন কেটে গেছে। কখনও বাবা সবাইকে নিয়ে আত্মীয় বাড়িতে উঠে বলতেন, চলে এলাম। তোর ধনবৌদিকে বললাম, মানু যখন আছে একটা হিল্লে হয়ে যাবে কিন্তু মা দু'একদিন পরই আর থাকতে চাইত না। বুঝতে পারতাম বাবার নির্বুদ্ধিতার শিকার হতে মা রাজি না তারপর ফের কোনো মন্দিরের পুরোহিত কিংবা কোনো স্টেশনে ফেলে আমাদের বাবা উধাও। এখন বুঝতে পারি, বাবা

ভয়ে উধাও হয়ে যেতেন। সামনে থেকে সন্তান সন্ততির অন্নক্লিষ্ট মুখ দেখবার কষ্ট সহ্য করতে পারতেন না। তখন পিলুর কাজ ছিল বাবাকে খুঁজে বেড়ানো। পাঁচ-সাতদিন পর বাবা ফিরতেন। কোথাও শ্রাদ্ধ অথবা শান্তি স্বস্ত্যয়ন করে বড় বোঁচকায় আতপ চাল, ডাল, তামার পয়সা, প্রণামীর কাপড় নিয়ে ফিরলে পিলুই সবার আগে ছুটে যেত। বাবা আসছে। আমাদের বাবা আসছে। দৌড়ে পিলু বাবার বোঝাটা নিজেই মাথায় নেবার জন্য পীড়াপীড়ি করত—দাও না বাবা। আমি ঠিক পারব। কাজেই পিলু এমন একটা স্বপ্ন দেখতেই পারে।

মহানন্দকে বললাম, পিলুকে আরও দু'টুকরো মাছ দাও।

পিলু বলল, না না। আর পারব না। আমাকে দিও না।

মায়া বলল, জানিস দাদা, বাবা মাঝে মাঝে আমাকেও স্বপ্নে দেখা দেয়।

আমি মুখ তুলে তাকালাম।

মায়া একটু বেশি ঝাল খেয়ে হুসহাস করছিল। হাত চাটতে চাটতে বলল, কেবল বলে সাজিটা ধরা

ঠিক বুঝতে না পেরে বললাম, কিসের সাজি?

আরে ফুলের সাজি। বাবা সকাল হলেই স্নান টান সেরে এসে পূজার ফুল তুলতেন না!

তখন আমাদের ঘরবাড়ি হয়ে গেছে। মাত্র একটা পঞ্জিকা সম্বল করে বাবা ঘরবাড়ি গড়ে তুলেছিলেন প্রথম দিকে বছরকার পঞ্জিকা বাবার যজমান নিবারণ দাসই দিত। একটা

পঞ্জিকা জীবনে কত বড় সম্বল বাবাকে না দেখলে তখন বোঝা যেত না। মানুষের শুভ দিনক্ষণ বলে দেবার মধ্যে জীবনের কত বড় মাহাত্ম থাকে তা একমাত্র বাবাকে দেখলে আমরা টের পেতাম।

সেই বাবাও আমার মাঝে মাঝে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতেন। স্কুলে পড়ছি বই নেই, বেতন বাকি, স্কুলে পরে যাবার জামা নেই, একজন পুরোহিত বামুনের সব দিক বজায় রাখাও কঠিন—শুধু অনাহার থেকে আত্মরক্ষাই তো মানুষের বেঁচে থাকার ধর্ম নয়—কাজেই মা'র খোঁটা দেবার স্বভাব যেমনকার তেমন। এতে পেট ভরে! এ-ভাবে মানুষ বাঁচে! মায়াটা ছেড়া ফ্রক গায়ে দিয়ে। থাকে, তোমার আক্কেল আছে!

বাবার তখন একটিই বাক্য—চণ্ডীপাঠ শুরু হয়েছে। আমি চললাম।

আমরা ভাই-বোনেরা মিলে বাবাকে তখন ঠাণ্ডা করতাম। আমাকে দেখলেই বাবা ভরসা পেতেন। আর কটা দিন সবুর করতে তোমার কি মাথা কাটা যাচ্ছে! বিলুটা পাস করলেই দেখবে সব বাসনা পূর্ণ হবে।

আমার প্রতি বাবার এই বিশ্বাসই আমাকে এতদূর টেনে নিয়ে এসেছে। সবার হয়ে ছায়া দেবার জন্য চারপাশে ডালপালা মেলে দিতে ইচ্ছে হয়েছে। এ-সব যখন ভাবছি তখনই আমার ছোট ছেলে বলল, বাবা, তুমি ঠাকুরদাকে স্বপ্নে দেখ না!

আমি ঠিক কিছু মনে করতে পারছি না। চুপ করে আছি।

পিলু বলল, বাবা তোর কাছে আসে না!

মা'র খাওয়া হয়ে গেছে। আজকাল কানে একটু কম শোনে বলে কি নিয়ে কথা হচ্ছে বুঝতে পারছে না। তাই নিবিষ্ট চোখে পিলুর দিকে তাকিয়ে আছে। এবং বিষয়টা বোধগম্য হতেই মা বলল, এসে আর দরকার নেই।

মায়া বলল, তুমি থাম তো মা। কি রে দাদা, সত্যি তুই বাবাকে কোনদিন স্বপ্নে দেখিসনি! এত করলি বাবার সংসারের জন্য!

মা কিছুটা রুষ্ট হল মায়ার কথায়। বলল, এসে তিনি কি উদ্ধার করবেন! বেঁচে থাকতেই কিছু। করল না। তারপর কেমন আশঙ্কা চোখে মুখে ফুটে উঠল মা'রা বলল, হ্যাঁরে, শিয়রে এসে তোর বাবা বসে থাকে না তো! শিয়রে এসে বসে থাকলে সকালে উঠেই পুকুরপাড়ে চলে যাবি। জলের কাছে স্বপ্নের কথা বললে ফলে না। তোর বাবাই আমাকে বলে গেছেন। যেদিনই তিনি আসেন। আমি সকালবেলায় নদীর পাড়ে চলে যাই। সব বলে দি।

আমি কি বলব ঠিক বুঝতে পারছি না। নন্দিনীও বাবাকে মাঝে মাঝে স্বপ্নে দেখে থাকে। বাবার নাকি তখন একটাই প্রশ্ন। শিবের মাথায় ফুল বেলপাতা দাও তো বৌমা? ওটা দেবে। দিলে ঘরে তোমার কোনো অশুভ প্রভাব ঢুকতে সাহস পাবে না। সবাই বাবাকে দেখো কেবল আমিই মৃত্যুর পর কোনদিন স্বপ্নে আর একবার খুব কাছাকাছি তাঁকে দেখতে পেলাম না। কেমন অভিমানের গলায় বললাম, না, আমি বাবাকে স্বপ্নে কোনোদিন দেখতে পাইনি আমার চোখে কথাটা বলতে গিয়ে কেন জানি জল এসে গেল। আমি আমার মাথা নিচু করে ফেললাম যেন বাবার জন্য আমার এই চোখের জল কেউ দেখতে না পায়।

তারপর একে একে বাড়িটা খালি হয়ে গেল। নন্দিনীর পীড়াপীড়িতেও কেউ দু'একটা দিন। বেশি থেকে যেতে রাজি হল না। নন্দিনী মাকে বলল, মা, তুমি ক'টা দিন কাছে থাকা তোমার কাছে থাকলে ও ভাল থাকে। মা'র এক কথা, না বৌমা, আমাকে যেতেই হবে। ঝুমিকে কথা দিয়ে এসেছি। ও একা গরু বাছুর সব সামলাবে কি করে! আকালের বৌকে শুতে বলেছি। আর একবার এসে থাকব।

সবাই চলে গেলে নন্দিনী বলল, তোমার চেয়ে ঝুমি এখন তাঁর কাছে বেশি!

আমি বললাম, ছোট থেকে বড় করলে মায়া বাড়ে ঝুমির জন্যই মা আমার এখনও বেঁচে আছে। আমরা মা'র বড় দুরে সরে গেছি।

আর সেদিনই রাতে বাবাকে স্বপ্ন দেখলাম। সেই গাছপালা নিয়ে আশ্রমের মতো বাড়ি। আমরা বাবার পাশে ভাইবোনেরা গোল হয়ে খেতে বসেছি। বাবা একটু দূরে আলগা হয়ে বসে আছেন কলাপাতায় মাংস ভাতা দেখছি—বাবার হাতে পায়ে মুখে বড় বড় ফোসকা শরীরে জায়গায় জায়গায় সাদা দাগা আগুন থেকে উঠে এসে যেন খেতে বসেছেন। আগুনে সারা শরীর ঝলসানো।ে। হাতে আঙুলে পর্যন্ত পোড়া ঘা। বললাম, বাবা মেখে খেতে আপনার হাত জ্বলছে। আমরা বরং কেউ খাইয়ে দিই আপনাকে।

বাবার সেই রহস্যময় হাসিটুকু মুখে আমার দিকে শুধু চোখ তুলে তাকালেন। তারপর মাথা নিচু করে বললেন, না জ্বলছে না। দাহ হচ্ছিল—তা সেখান থেকেই উঠে এলাম। তোমরা সবাই মিলে ভাল মন্দ খাচ্ছ আমি বাদ থাকি কেন! সঙ্গে সঙ্গে গা-টা আমার ভয়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। আমি মরে গেলে নন্দিনীও আমাকে ভয় পাবো আর ঘুম এল না।

কেন যে এমন বিশ্রী একটা স্বপ্ন দেখলাম! ঘামছিলাম ঘরের জানালা সব খোলা, পাখা ঘুরছে। তবু কেন যে মনে হল রুদ্ধ এক কক্ষে আমি নিজের বধ্যভূমিতে দাঁড়িয়ে আছি। দরজা খুলে ব্যালকনিতে ঢুকে ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিলাম। কাউকে ডাকলাম না, নিঃশব্দে দু-হাত উপরে তুলে শুধু বললাম, বাবা আপনি যদি এলেনই—এ-ভাবে কেন আমার কাছে এলেন! তারপর ডাকলাম, নন্দিনী, ছবি, বকুল! ওরা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। কোনো সাড়া নেই। অনেক দূরে একটা রেল-ইঞ্জিনের শুধু টংলিং টংলিং শব্দ শুনতে পেলাম। সামনে শুধু আকাশ আর তার অজস্র নক্ষত্রমালা—নিচে মানুষের ঘরবাড়ি, মাঠ, শস্যক্ষেত্র আমি না থাকলে সত্যি ওদের আর কেউ নেই কেন জানি এমন মনে হল। আমার কেন জানি নিজের জন্য, ঘরবাড়ির জন্য, নন্দিনী ছবি বকুলের জন্য আরও মায়া বেড়ে গেল। তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে নন্দিনীর পাশে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়লাম। আমি মরে গেলে নন্দিনী আমাকে ভয় পাবে মনে থাকল না। এরা আছে বলেই বেঁচে আছি, বেঁচে থাকব।